ইসলাম এবং কুসংস্কার-(ষষ্ঠ খন্ড)

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ
জনুয়ারী ১, ২০০৫

(পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে যারা আমার 'প্রথম খন্ড 'পাঠ করিয়াছেন তারা ইচ্ছে করলে 'ভূমিকাটি' স্কীপ করতে পারেন, কারণ এই ভূমিকা প্রত্যেক খন্ডেই যাবে এবং ভুমিকা একই থাকবে, যদিও দ্বিতীয় খন্ডে ভুমিকাটিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অবশ্য যারা আমার প্রথম খন্ড পড়েন নাই, তাদের জন্য এই ভূমিকাটি অতি প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত ভাবে প্রত্যেক খন্ডে সুধু ইসলামী কুসংস্কারগুলোর নতুন ক্রমিক নং হিসেবে আরও নতুন নতুন চমকপ্রদ সব আজগুবি ইসলামী কেচ্ছা-কাহিনী চলতে থাকবে।)

ভূমিকা

আমরা সবাই জানি যে কুসংস্কার হল কোন **popular belief held without any reason or logic**. অর্থাৎ কিনা কোন প্রমান বিহীন কথা যাহা সাধারনতঃ মুর্খরা অন্দ্ধভাবে বিশ্বাস করে থাকে। এই কুসংস্কার আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে যেমন, রূপকথার **(Folklore)** কাহিনী যাহা কুসংস্কার হলেও তাকে লোককথা বা কেচ্ছা-কাহিনী হিসেবেই ধরা হয়। অন্যটি হল ধর্মীয় কুসংস্কার যাহা একটি অলৌকিক বিশ্বাসের উপর নিহিত থাকে। মুলতঃ অজানা ভয়, পরকালের চিন্তা এবং অলৌকিকতা থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়। ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করে বললে এটাই দাড়ায় যে মানুষের পরকালের অজানা ভয় এবং তা' থেকে সৃষ্ট অবাস্তব কুসংস্কার থেকেই জন্ম হয়েছে পৃথিবীর সকল ধর্ম। তাই দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মের আসল উপাদানই **(Ingredients)** হল কিছু অবাস্তব কুসংস্কার। বিশ্বের প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মেই দেখা যায় অনেক কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস। এদিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে কুসংস্কার এর ছড়াছড়ি। ইসলাম ধর্মে এত বেশি কুসংস্কার পাওয়া যায় যে এই ধর্মটির মুল স্তম্ভটিই দাঁড়িয়ে আছে কিছু পৌরানিক এবং অলৌকিকতাপুর্ন কুসংস্কারের উপর।

ইসলামের মুল কিতাব কোরান এবং অসংখ্য হাদিস পড়লে এমন অনেক কুসংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় উম্মাদনা বা **fanatical believers** বা অন্ধবিশ্বাসীদের ধর্মীয় মাতম।

বাংলাদেশের বাজারের আনাচে-কানাচে খোজ করলে দেখা যায়, বাজারের বুক-স্টোর, ইসলামিষ্টদের লাইব্রেরী গুলোতে, এমনকি শহরের ফুটপাতেও

(ফাতেমোল্লার ফুট পাতের চাঁদ তাঁরা) এরুপ হাজার হাজার ইসলামী কিতাব পাওয়া যায় যেগুলোতে কুসংস্কার এ ভর্তি। এইসব ইসলামি কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু বই যেমনঃ **বেহেশ্‌তের কুঞ্জি, বেহেশ্‌তী জেওর, মোকসেদুল মুমিনিন, কাছাছুল আম্বিয়া, নেয়ামুল কোরান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।** এইসব ইসলামী কিতাব বাংলা দেশের মত মুসলিম দেশে এত বেশি জনপ্রিয় যে পাবলিসার্শদেরকে ৩০-৪০টি সংস্করন বের করেও কুলোতে পারছেনা।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি কিতাবের মধ্যে **‘কাছাছুল আম্বিয়া’** সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে অতি প্রয়োজন মনে করছি। এই ইসলামী কিতাবটি অন্যসব ইসলামী কিতাব থেকে বেশ আলাদা ভাবে ধরা হয়। কারণ এই কিতাবটি কোন মোল্লা-মাওলানার নিজের মনগড়া কথায় ভর্তি নয়; এই কিতাবটির নাম **‘কাছাছুল আম্বিয়া’** যার অর্থ দাড়ায়—**‘নবীগনের জীবনী’**। এই বইটিতে আরবের বুকে যত নবী পয়দা হইয়াছে এবং যাহাদের নাম পবিত্র কোরানে এবং হাদিসে জায়গা পেয়েছে তাদেরই জীবন-কাহিনীতে ভর্তি। অর্থাৎ, এই কিতাবে যাহা লিখা আছে তাহা পবিত্র কোরান ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে এবং এই বইটির (আমি যে বইটি ব্যবহার কর্‌ছি) প্রনেতা একজন সুশিক্ষিত মুসলমান নাম তার— এম, এন, এম ইমদাদুল্লাহ (এম এ; বি এ (অনার্স); এম এ)। কিতাবটির আকৃতি এবং চেহারা একেবারে কোরানের ন্যায় এবং এর সম্মানও অনেক বেশি। লাইব্রেরী গুলোতে এবং ভক্তদের ঘরে একেবারে উপরের Shelf এ কোরানের ঠিক পাশেই তার স্থান হয়। বইটির দামও বেশ, বলতে গেলে একটি অনুবাদ কোরানের চেয়েও মুল্য অধিক। এই কিতাবের ৯০% কথাবার্তাই ভীষন কুসংস্কারে পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এইসব আবেগ পুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী—সাধারন বিশ্বাসী মুসলিমগন পড়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে আরওবেশি করে নামাজ-রোজাতে মনোনিবেশ করবে এবং যাদের বিশ্বাস হাল্কা বা বিশ্বাস নেই তারা এইসব আজগুবী কথা পড়ে হেসে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে বলেই আমার মনে হয়!

যা হউক, এসব কুসংস্কার পুর্ন ইসলামী কিতাব গুলো বাংলাদেশের ঘড়ে ঘড়ে পাওয়া যাবে এবং **এইসব কিতাবই হল বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিম-আমজনতার আসল শিক্ষক বা গুরু।** ইসলাম ধর্মের অনেক শিক্ষাই এরা পেয়ে থাকে এইসব ইসলামী কিতাব থেকে। আর এইসব কিতাবের প্রভাবেই বাংলাদেশের মুসলিম-আমজনতার কাছে ধর্মীয় পীর-ফকির-দরবেশগন অতি প্রিয় হয় যে কারনে বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে পীরের ব্যবসা, তাবিজের ব্যবসা একেবারে রমরমা। কোন কোন স্বার্থান্বেষী মাওলানারা *(যেমন রাজাকার-মাওলানা সাঈদী)* আবার এসব আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী কাফেরদের তৈরী কেসেটে বন্দ্বি করে বাজারে দেদার বিক্রি করছে এবং কিছু কুসংস্কারপুর্ন মিথ্যা কথা বিক্রি করে সাধারণ গরীবের পকেট লুট করে নিচ্ছে। এসবই হচ্ছে ইসলামের নামে,আল্লাহর তায়ালার নামে!

বাংলাদেশের গাও-গ্রামে এমনকি আজকাল শহরেও অসংখ্য ইসলামি জলসা বা ওয়াজ-মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে হাজার হজার সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, এমনকি অনেক শিক্ষিত বড় বড় ডিগ্রিধারী অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানরাও মাওলানাদের ওয়াজ তন্ময় হয়ে শুনে থাকে। এইসব মাওলানাদের বক্তব্যে **বেশি অংশই থাকে কুসংস্কার পুর্ন ইসলামের বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী এবং নানারঙ্গের ধর্মীয় উপাখ্যান।** বলা বাহুল্য, উপরোল্লিখিত **'কাছাছুল আম্বিয়া'** কিতাবটিই যে মাওলানাদের আসল সম্বল, এতে কোন সন্দেহ নেই। এইসব কুসংস্কারপুর্ন গল্প মাওলানাদের মুখে শুনার পর গ্রাম্য সাধারণ মুসলমানদের মনে অনেক কুসংস্কারপুর্ন কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস হয় এবং তাদের মনে সর্বদা কুসংস্কারপুর্ন ভয়ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তারা সকলেই একটা অজানা অলৌকিকতার সাগরে সদাসর্বদা ডুবে থাকে। কেহ কেহ আবার এইসব কুসংস্কারপুর্ন কেচ্ছা-কাহিনী শুনে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে বুক ভাষায়।

ছোটবেলা এমনি অনেক ওয়াজ-মাহফিলে গিয়ে মাওলানাদের সুমধুর কণ্ঠে অনেক কুসংস্কারপুর্ন গাজাখুরি গল্প শুনে মাঝে মাঝে চিন্তা হত যে এইসব মাওলানারা কোথায় পায় এত কুসংস্কার। তাদের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হতাম। এখন দেখছি যে ইসলামি কিতাব গুলোতে কুসংস্কারের কোন অভাব নেই মা'শাল্লাহ। উল্লেখিত ঔসব ইসলামী কিতাব থেকেই পাঠকদের জন্য কিছু ইসলামি কুসংস্কারের নমুনা পেশ করছি আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে। উল্লেখ্য, এইসব কুসংস্কার ইসলামী কিতাব থেকে হুবুহ বই থেকে তুলে দিচ্ছি এবং ইহাতে আমার নিজের সৃষ্টি কিছুই নেই। তবে মাঝে মাঝে আমার অল্প কিছু রসালো মন্তব্য (*ব্রাকেটের ভিতরে*) থাকবে। আমার এবারকার ইসলামি কুসংস্কারে সিরিজ কিছুদিন ধরে চলবে আশ করি। এবারে আসুন, আমরা খুজে দেখি মুসলিম-আমজনতা কি ধরনের কুসংস্কারে সর্বদা ডুবে থাকে!

(বিঃ দ্রঃ পুর্বের খন্ডে ২৬-৩১ সংখ্যা পর্যন্ত লেখা হয়েছিল)

(৩২) <u>পৃথিবীতে সুর্য্য কি ভাবে পয়দা হইল!</u>

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে যখন দুনিয়াতে পাঠান হইয়াছিল তখন সমগ্র দুনিয়াব্যাপী গাঢ় অন্দ্ধকার বিরাজ করছিল। হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া তিনশত বৎসরকাল সেই অন্দ্ধকারের মধ্যেই দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। তারপর যেদিন প্রত্যূষে হযরত আদম (আঃ) এর প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হইল এবং আল্লাহ পাক তাঁহার গুনাহ মার্জনা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) ইহার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আল্লাহর দরবারে দু'টি সেজ্‌দা আদায় করলেন এবং সেজ্‌দা আদায় করিয়া যখন আদম (আঃ) তাহার মস্তক উত্তলন করিলেন, তখনই দেখিলেন পুর্বদিক থেকে উষার সুর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং অপুর্ব আলোকে সারা জাহান আলোতে উজ্জল হইয়া গিয়াছে। সেদিন থেকেই প্রতিদিন সুর্য্য উদয় হয়ে থেকে। (*সোবাহানাল্লাহ! কত বড় বৈজ্ঞানিক সত্য কথা শুনিলাম!*)

(৩৩) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আগুনের সৃষ্টি কি ভাবে হইল!

আল্লাহ তায়ালা একদা ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে জিব্রাঈল! তুমি সাতখন্ড লৌহ লইয়া আদমের কাছে গমন কর এবং গিয়া তাকে কর্মকারের কাজ শিখিয়ে দাও যেন সে লৌহ দ্বারা অস্ত্রাদি তৈরী করিতে পারে। এই আদেশ পাইয়া ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল (আঃ) দুনিয়াতে যেয়ে আদমকে লৌহ দ্বারা অস্ত্রাদি বানানো শিখাতে গিয়ে দেখলেন আগুনের প্রয়োজন হবে। আগুন ব্যতীত লৌহ বিগলিত করা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল আবার আল্লাহর কাছে ফিরে এসে আগুনের জন্য আরজ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, দোজকের দারোগা মালিকের নিকট যেয়ে কিছু আগুন চেয়ে নাও। কথামত জিব্রাঈল দোজক থেকে কিছু আগুন এনে যমিনে রাখিলেন। কিন্তূ জাহান্নামের আগুনের তেজ এত ভীষন যে, যমিন ভেদ করিয়া উহা আবার জাহান্নামে চলিয়া গেল। জিব্রাঈল আবার আকাশে ফিরে কিছু আগুন এনে যমিনে রাখলেন, কিন্তূ এবারও আগুন আবার জাহান্নামে ফিরে গেল। এভাবে একে একে সাতবার জিব্রাঈল আগুন আনিল এবং আগুন পুনরায় ফিরে গেল দোজকে। তখন নিরূপায় জিব্রাঈল আল্লাহ তায়ালার কাছে এই ঘঠনা বর্ণনা করিলে আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈলকে আদেশ করিলেন হে জিব্রাঈল! তুমি এই দোজকের আগুনকে সাত সমুদ্রের পানি দিয়ে ধৌত করিয়া আদমের কাছে নিয়ে যাও। ফেরেশ্‌তা ঠিক তাহাই করিলেন এবং আগুনের তেজ কিছুটা কমিল এবং সেই আগুন আদমের কাছে সমর্পন করলেন এইবার উক্ত আগুন দুনিয়ার কাজের উপযুক্ত হইল। (*সোবাহানাল্লাহ!! আল্লাহর কত কুদরত!)*

(৩৪) গরুর জবান (কথা বলা) বন্দ্ধ হইল কি ভাবে!

লৌহ দ্বারা অস্ত্রসস্ত্র তৈরী করার পর আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈলকে হুকুম করিলেন আদমের জন্য বেহেশ্‌ত থেকে দুটি গরু এবং একমুষ্টি গম সরবরাহ করতে যেন আদম (আঃ) কৃষিকাজ করিতে পারে দুনিয়াতে। এই আদেশ পাওয়ার পর জিব্রাঈল (আঃ) বেহেশ্‌ত থেকে দুটি ভাল গরু এবং একমুষ্টি গম আদম (আঃ)কে সরবরাহ করলেন। কিন্তূ, আদম (আঃ) যখন গরু দুটি দিয়ে জমি কর্ষন করিতে গেলেন, তখন সেই গরু দু'টি নিয়ে পড়লেন মহা সমষ্যায়। আল্লাহর কুদরত বুঝার কারও সাধ্য নেই। দুটি গরুর একটি অত্যন্ত দুষ্টমী শুরু করিল এবং আঁকা বাঁকা হইয়া চলিতে লাগিল। তাহাতে রাগ হইয়া আদম গরুর পৃষ্টে লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করিলেন। গরুটি চিৎকার করে বলিল হে আদম তুমি আমাকে কেন আঘাত করছ, আমিত অনেক ব্যথা পাই। আদম তখন বলিলেন—গরু তুমি আঁকা বাঁকা হইয়া চলিতেছ কেন? গরু তখন বলিল—তুমিওত বেহেশ্‌তে থাকা কালিন আল্লাহর আদেশ অমান্য করিয়া আকিয়া বাকিয়া চলিয়াছ। এখন অন্যের বাঁকাইয়া চলা ভাল লাগেনা। গরুর এরূপ কথা শুনিয়া আদম (আঃ) মনের দুঃখে চাষাবাদ বন্দ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ফেরেশ্‌তা জিব্রাঈল এঘঠনা দেখিয়া আবার আল্লাহর কাছে গিয়ে এই ঘঠনা বর্ণনা করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তখন আদমের প্রতি দয়া প্রবশ হইয়া গরুর জবান বন্দ্ধ করিয়া দিলেন এবং আদমকে বলিলেন—যাও চাষাবাদ কর

মানুষ তাকে অবাদে শাসন-শোষন করিতে পারিবে এবং ইহাতে কোন অন্যায় হবে না।

(৩৫) দুনিয়াতে মানব বংশ বিস্তার কি ভাবে শুরু হইল!

হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া যেহেতু আদি মানব ও মানবী, সুতরাং তাহাদের দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে মানুষের বংশ বিস্তার শুরু করিলেন। আদম এবং হাওয়ার গর্ভে সর্বমোট দুইশত উনচল্লিশজন সন্তান জন্মলাভ করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আদমের সন্তান জন্মের ব্যাপারে একটি বিশেষ নিয়ম ঠিক করিয়াছিলেন। অর্থাৎ একমাত্র শীস (আঃ) ব্যতীত তাহাদের সব সন্তান একসাথে জোড়ায় জোড়ায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। একই সঙ্গে একটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান জন্মলাভ করিত। এক জোড়ার পুত্রের সাথে অন্য জোড়ার কন্যার বিবাহ হইত। কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে যে হযরত আদম (আঃ) এর স্ত্রী বিবি হাওয়া মোট একশত আসিবার জোড়ায় জোড়ায় সন্তান প্রসব করিয়াছেন এবং একবার মাত্র একজন সন্তান অর্থাৎ হযরত শীসকে জন্ম দিয়েছিলেন। তাহাতে হযরত আদম (আঃ) এর মোট ৩৬১ জন সন্তান জন্ম গ্রহন করিয়াছিল।

(৩৬) আল্লাহ তায়ালা মাবুদ ফেরেশ্তাদের কয়টি ডানা দিয়েছেন!

আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশ্তা পয়দা করার ইচ্ছা করিলেন, তখন তিনি হযরত রাসুলে করিম (দঃ) এর নূর মোবারক থেকে এক খাছ নূর পয়দা করতঃ সেই নূর দিয়ে ফেরেশ্তা সৃষ্টি করিলেন। এই ফেরেশ্তাগন আল্লাহর সকল হুকুমদারী পালনে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তাহারা প্রতিদিন ভোর সকালে আল্লহর সম্মুখে হাজিরা দেওয়ার জন্য কাতার দিয়ে দন্ডায়মান হয়। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্তাদেরকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করিয়াছেন যদ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে তারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে বার বার অতিক্রম করিতে পারে দ্রুতগতিতে। ফেরেশ্তাদের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। **পবিত্র কোরানের সুরা ফাতিরে (ফাতিরঃ ১)** বলা আছে যে আল্লাহ ফেরশ্তাদেরকে দুই, তিন এবং চার পাখা বিশিষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন। **মুসলিম হাদিসে উল্লে**খ আছে যে—**হযরত জিব্রাঈলকে আল্লাহ ছয়শত পাখা দিয়েছেন** (কুরতুবী ইবনে কাসীর)।

(৩৭) হযরত আদম (আঃ) কত ফুট লম্বা ছিলেন!

আমাদের পেয়ারে নবী বলিয়াছেন—''আল্লাহ তায়ালা মনুষ্য-গুষ্টির পিতা আদম (আঃ) **কে ৯০ ফুট লম্বা বানিয়েছিলেন।**'' সহি হাদিস (সহি-বোখারী, ভলিউম-৪, বুক-৫৫ নং ৫৪৩ এবং সহি-বোখারী ভলিউম-৪, বুক-৫৫, নং-৫৪৪) এর মতে ঘটনা নিম্নরূপঃ— আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন—''আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন,

করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আদমকে তৈরী করে বলেন, যাও ফেরেশ্তাগনকে সালাম দাও এবং শুন ফেরশতারা কি উত্তুর দেয়। আদম যখন বলিল, 'সালামু-আলাই-কুম' তখন ফেরশতারা জবাব দিল—'আসসালামু আলাই-কা-ওয়া-রাহমুতু-ই-লাহী'। এবং সেদিন থেকেই দুনিয়ার মানুষ এইরূপভাবে পরস্পর সম্বর্ধনা আদান-প্রদান করিতে থাকে।

নবী করিম আরও বলেন—'যেসব নেকী মানুষ সর্বপ্রথম বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে তাদের শরীরের জ্যোতি হবে পুর্নিমা **(Full-moon)** চাঁদের মত; এবং তাদেরকে যারা follow করবে তাদের শরীরের জ্যোতি হবে আকাশের উজ্জল তারকারাশির মত। তারা কেহ প্রশ্রাব করিবে না, বাহ্য ত্যাগ করিবে না, থুথু ফেলিবেনা এমনকি নাক থেকে কোন কিছুই বের হবে না। তাদের চিরনী হবে স্বর্নের তৈরী এবং তাদের ঘাম থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি বের হবে। বেহেশতের সুন্দুরী হুরগন হবেন তাদের স্ত্রী। তারা সকলেই প্রায় একই রকম দেখা যাবে এবং তাদের শরীর হবে **আদমের মত ৯০ ফুট লম্বা। সোবাহানাল্লাহ!!!**

(৩৮) <u>পৃথিবীতে স্বর্ন এবং রৌপ্যের উৎপত্তি কিভাবে হইল!</u>

হযরত আদম (আঃ) তার বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। তাহার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল ৩৬১ জন এবং তাহাদের সকলের আওলাদের মোট সংখ্যা ছিল মোট ৪০,০০০ হাজার। উল্লিখিত সংখ্যক মানব সন্তানের দুনিয়াতে প্রাথমিক অবস্থায় ভরন-পোষনের সমষ্যা সৃষ্টি হওয়ায় তাহাদের অনেক কষ্ট হচ্ছিল সুধু কৃষি কাজের উপর নির্ভর করা। তখন তাহারা সকলে তাদের আদি-পিতা আদমের (আঃ) কাছে বলিলঃ ''আপনি এখন বার্দ্ধক্যে উপনিত হইয়াছেন, অতএব আপনি আমাদের জন্য এমন কিছু রেখে যান যাহা দ্বারা আমরা সাচ্ছন্দের সাথে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারি। বংসধরদের কথা শুনিয়া আদম (আঃ) আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিলেন, হে মাবুদ! আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন আমার বংশধরগন কি বলিয়া গেল! এখন আপনি আমার জন্য একটি ব্যবস্থা করিয়া দিন যাহার মাধ্যমে আমি উহাদেরকে খুশী করিতে পারি।

হযরত আদম (আঃ) এর প্রার্থনা শুনিয়া আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিব্রাঈলকে হুকুম করিলেন! হে জিব্রাঈল! তুমি বেহেশ্ত থেকে দুই মুষ্টি স্বর্ন ও চান্দি লইয়া গিয়া আদমের কাছে দিয়া আস। জিব্রাঈল আল্লাহর নির্দেশ মত দুই মুষ্টি স্বর্ন ও চান্দি আনিয়া আদমের হাতে দিয়া বলিল—আপনি এই এই স্বর্ন-চান্দি টুকু পাহারের উপরে নিক্ষেপ করুন এবং তাহাদেরকে বলুন—ঔ পাহাড় হইতে কিছু কিছু স্বর্ন ও রৌপ্য নিয়া যেন ব্যবসা-বানিজ্য করে, তা'হলে তাহাদের অনেক মুনাফা হইবে এবং সেই মুনাফা দিয়ে তাহারা স্বচ্ছল ভাবে জীবন-যাপন করিতে পারিবে। আর ঔ স্বর্ন-রৌপ্য কোন দিন শেষ হইবে না। বলাবাহুল্য সেইদিন থেকেই দুনিয়াতে স্বর্ন-রৌপ্যের অবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

(সমস্যাটা হইল তখনত আর অন্য কোন জনপদের অস্তিত্ব ছিলনা, তা'হলে আদমের সন্তানগন কার সঙ্গে ব্যবসা-বানিজ্য করিয়াছিল ঔসব স্বর্ন ও রৌপ্য দিয়ে?)

(৩৯) শাদ্দাদের বেহেশ্‌ত-খানা কিভাবে তৈরি হয়!

পাঠকগন নিশ্চয় শুনে থাকবেন এই শাদ্দাদের বেহেশ্‌ত তৈরির আজব কাহিনী বিশেষ করে বাংলাদেশের মোল্লা-মাওলানারা তাদের জালাময়ী ওয়াজ-মাহফিলে এই গাজাখুরি কেচ্ছাটি প্রায়ই শুনিয়ে থাকে ভক্তদেরকে। তবে আজ শুনুন পবিত্র কাছাছুল আম্বিয়াতে বর্ণিত সেই আজব কাহিনী।

প্রাচীন বাদশাহ আদের দুইটি পুত্র-সন্তানের একজনের নাম ছিল শাদ্দাদ এবং সেছিল খুবই অহঙ্কারী এবং চালাক। তাকে হেদায়ত করার জন্য আল্লাহ হযরত হুদ (আঃ) কে তার দরবারে পাঠান। হুদ (আঃ) শাদ্দাদকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার জন্য উপদেশ দিলেন। চালাক এবং চতুর শাদ্দাদ হুদ (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলঃ ''আমি যদি আল্লাহর প্রতি ইমান আনি তা'হলে আল্লাহ আমাকে কি দিবেন?'' তখন হযরত হুদ (আঃ) উত্তুর দিলেন—আল্লাহ তাকে অফুরন্ত পরম সুখের আগার বেহেশত দান করবেন। তখন শাদ্দাদ বলিল—''আমি নিজেই তদ্রুপ একটি সুখের বেহেশ্‌ত তৈরী করে নেব। শাদ্দাদ বেহেশ্‌ত বানাবার কথা শুধু মুখেই বলিল না; সে সত্যি সত্যি একটি বেহেশ্‌ত তৈরীর জন্য প্রস্তূত হইতে লাগিল। সে তার ভাগিনেয় রাজা জোহাক তাজীকে অনুরোধ করিল তার রাজ্যের যত স্বর্ন-রৌপ্য এবং মুল্যবান লালা, মুতি ও জওহেরাত, মেশ্‌ক আম্বর এবং জাফরানী যাহা কিছু আছে তাহা যেন শাদ্দাদের রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। ভাগিনেয় ছাড়াও আরও দুনিয়াতে যত রাজা-বাদশা ছিল সবাইকে আদেশ করিল তারাও যেন রাজ্যের যত স্বর্ন-রৌপ্য এবং মুল্যবান লালা, মুতি ও জওহেরাত, মেশক আম্বর এবং জাফরানী যাহা কিছু আছে তাহা যেন শাদ্দাদের রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। শাদ্দাদের এই বেহেশ্‌ত বানাবার জন্য সারা দুনিয়াতে স্থান খুজতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত আরব সিমান্তে ইয়ামন প্রদেশের একটি স্থানকে বেহশ্‌ত তৈরীর জন্য ঠিক করা হল। জায়গাটির আয়তন ছিল একশত চল্লিশ ক্রোশ।

বেহেশ্‌ত নির্মান করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার দক্ষ কারিগর আসিয়া জমা হইল এবং বেহেশ্‌ত নির্মানের কাজ শুরু হইল। হাজার হাজার সুদক্ষ রাজমিস্ত্রি-কারিগর কাজে লিপ্ত হইল। সর্বপ্রথম বিশাল ভুখন্ডের চারিদিকে চল্লিশগজ জমি খুদিয়া মৃত্তিকারাশি উঠাইয়া ফেলিয়া তাহা মর্মর দ্বারা বেহেশ্‌তের প্রসাদের ভিত্তি গাথা হইল। তাহার উপর স্বর্ন ও রৌপ্যের ইষ্টক দ্বারা প্রাচীর নির্মিত হইল। প্রাচীরের উপর জবরজদ এবং জমররদ পাথরের ভীম ও বর্গার উপরে লাল বর্ণের আলমাছ প্রস্তর ঢালাই করিয়া প্রসাদের ছাদ নির্মান করা হইল। মুল প্রসাদের ভিতরে অসংখ্য অট্টালিকা যেটা যেভাবে শোভনীয় হয় সেইভাবে

বর্ণানা করা সম্ভব নহে। উহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অভাবনীয় বটে। সেই বেহেশ্‌তের কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরানে পাকে উল্লেখ করিয়াছেন যে 'হে মুহাম্মদ! শাদ্দাদ দুনিয়াতে এমন বেহেশ্‌ত নির্মান করিয়াছিল, দুনিয়ার কোন বাদশাহ কোন দিনই তেমন প্রসাদ বানাইতে পারে নাই। হে মুহাম্মদ! তুমিত দেখ নাই তোমার প্রতিপালক সেই বেহেশ্‌ত নির্মানকারীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।'

শাদ্দাদের সেই বেহেশ্‌তের মাঝে মাঝে তৈরী করা হয়েছিল স্বর্ন ও রৌপ্যের দ্বারা অপুর্ব বৃক্ষসমুহ। উহার সাখা-প্রশাখাগুলি তৈরী হইয়াছিল ইয়াকুত পাথর দ্বারা এবং পত্র-পল্লব নির্মিত হয়েছিল ছঙ্গে জমররদ দ্বারা এবং ঔসব বৃক্ষের ডালে ডালে মুল্যবান মনি-মুক্তা ও হীরা-জহরতের তৈরী বিভিন্ন রকমের ফল শোভা পাইতেছিল। কথিত আছে যে এই বেহেশ্‌ত নির্মান করিতে প্রতিদিন অন্ততঃ চল্লিশ হাজার গাধার বোঝা স্বর্ন ও রৌপ্য নিঃশেষ হইয়া যাইত। এভাবে একাধারে তিনশত বৎসর উহার নির্মান কার্য চলিয়াছিল।

তারপর এই বেহেশ্‌ত নির্মান শেষ হইল এবং কারিগরগন শাদ্দাদের কাছে যেয়ে আরজ করিল—'হুজুর আপানার বেহেশ্‌ত নির্মান শেষ হইয়াছে।' শাদ্দাদ শুনিয়া খুব খুশি হইল এবং কর্মচারীদেরকে হুকুম করিল—**যে রাজ্যের যাবতীয় সুন্দর বালক এবং সুন্দরী বালিকাগনকে বেহেশ্‌তে আনিয়া একত্রিত কর; তাদেরকে সুন্দর বসন-ভুষনে সজ্জিত করিয়া বেহেশ্‌তে মোতায়ন কর যেন তাহারা বেহেশ্‌তের হুরী-গ্যালমান হিসেবে বেহেশতবাসীদের খেদমতে নিযুক্ত থাকিতে পারে।** শাদ্দাদের কথামত সকল ব্যবস্থা করা হইল। অবশেষে শাদ্দাদ বাদশা তার নির্মিত বেহেশত দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক লশকর, রাজ কর্মচারী, পাইক-পেয়াদা ও দাস-দাসীসহ বেহেশ্‌ত অভিমুখে রওয়ানা হয়ে বেহেশ্‌তের দরজার নিকটে একজন অপরিচিত লোক বসিয়া আছে দেখিয়া শাদ্দাদ জিজ্ঞেস করিল— কে তুমি? উত্তুর আসিল—আমি মালাকুল মওত আজ্রাইল এবং আমি তোমার জান কবজ করিব। শাদ্দাদ বলিল—আমাকে একটু সময় দাও, আমি আমার তৈরী পরম সাদের বেহেশ্‌ত এক নজর দেখে নেই। আজ্রাইল উত্তুর দিল—আল্লাহর কোন আদেশ নেই যে আমি তোমাকে একটু সময় দেই। তখন শাদ্দাদ তার ঘোড়া থেকে এক পা নিচে বেহেশ্‌তের চৌকাটে ফেলিল এবং অমনি আজ্রাইল তার জান কবজ করিয়া ফেলিল। শাদ্দাদের বেহেশ্‌ত দেখিবার আশা চিরতরে নির্মুল হইয়া গেল। এদিকে আল্লাহর আদেশে ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল আসিয়া **এমন এক প্রচন্ড হাঁক মারিল যে** সেই প্রচন্ড হাঁকে সাদ্দাদের সকল লোক-লস্কর ধংস হইয়া গেল। তারপর আল্লাহর আদেশে ফেরেশ্‌তারা এসে সাদ্দাদের বেহেশ্‌ত মাটির নিচে লুপ্ত করিয়া দিল।

*(পাঠকগন আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এই প্রচন্ড গাজাখুরি কেচ্ছাটি তৈরী করিতে আল্লাহ এবং মুহাম্মদকে অন্ততঃ **চল্লিশ ছিলিম বিশুদ্ধ গাজা** টানতে হয়েছিল।)*

হযরত শাহ সেকান্দর এস্কান্দারিয়া বা আলেকজান্দ্রিয়া নগরে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। হযরত যুল-কারণাইন দুনিয়ার এক বিশাল সাম্রাজ্যের একজন সুশাসক, সুবিচারক ও অতি ন্যায়পরায়ন ধার্মিক ছিলেন। রসুলে করিম (দঃ) নিজেকে আল্লহর নবী দাবী করাতে মক্কার কাফিরগন ওনাকে অপদস্থ করার জন্য এই যুল-কারণাইন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। রসুলে করিম জিব্রাঈলের কাছে যুল-কারণাইনের সমস্ত ইতিহাস জেনে (যাহা পবিত্র কোরানে উল্লেখ আছে) তারপর মক্কার কাফিরদেরকে যুল-কারণাইনের কাহিনী হুবুহ আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরানের ভাষায় শুনালেন—'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাদশাহ যুল-কারণাইনকে দুনিয়ার পাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরাট এলাকাব্যাপী সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা প্রধান করিয়াছিলেন। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের যাবতীয় এলাকা ও তাহার পথ-ঘাটের সহিত আল্লাহর মহিমায় বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বাদশা সেকান্দরের উপর ব্যাপক দ্বায়ীত্ব চাপাইয়া দিয়াছিলেন। তাই সুধু তার নিজের রাজ্যে ধর্ম-কর্ম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাই তাহার জন্য যথেষ্ট ছিল না, স্বদেশের বাহিরেও তাহার জন্য কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। সেই কর্তব্যের খাতিরেই তাহাকে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দূর-দুরান্তে সফর করিত হইয়াছিল।

শাহসেকান্দর আল্লাহর ইচ্ছায় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর এবং অস্ত্র-সস্ত্র লইয়া পুর্ব এবং পশ্চিমের দেশ অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি মাগরেব সিমান্তে রয়ানা হইলেন এবং পথে যত দেশ অতিক্রম করিলেন সকল দেশই তাহার অধীনে আসিল এবং দ্বীনের প্রচার করিয়া তথাকার অধিবাসীদের ধর্মের দীক্ষা দান করলেন। নানা কাফির মুল্লুকে দ্বীনের বিজয় সাধন করিয়া দ্বীনের নিশান উড়াইয়া দিলেন। অনেক দেশের ক্ষমতাশালী বিধর্মী শাসক জোরে-সোরে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল এবং অবশেষে দ্বীন-ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করিয়া জীবন ধন্য ও স্বার্থক করিয়া লইল। এইভাবে বহু দেশ ভ্রমন করিয়া হযরত যুল-কারণাইন বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হইলেন এবং তাথাকার পবিত্র গৃহে যিয়ারত করতঃ জীবন ধন্য ও স্বার্থক করিয়া কিছু দিন সেখানে অবস্থান করিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে পুনরায় রওয়ানা হইয়া দুনিয়ার পুর্ব সীমান্তের দিকে চলিতে লাগিলেন।

(সেখানে যুল-কারনাইন বহু সব আজগুবি ঘটনার জন্ম দিয়েছেন যাহা আমি আর বর্ননা না করিয়া কিছু কিছু প্রসিদ্ধ গাজা-খুরি গল্পের বর্ণনা করিব যাহা নিম্নে দেওয়া হইল)

(৪১) শাহ সেখান্দর কর্তৃক ইয়াজুজ-মাজুজ কে প্রাচীর বদ্ধ করা কিভাবে হইল!

পাঠকগনের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করছি যে এই ইয়জুজ-মাজুজের গাল-গপ্প পবিত্র কোরানে বর্ণিত আছে এবং এই ঘটনা নিয়ে বাংলা দেশের গাও-গ্রামের ওয়াজ মাহফিলে মোল্লা-মাওলানারা অনেক উচ্চ-স্বরে ওয়াজ করে

তার পুর্ন বিবরন দেওয়া হইল।

‘অতপর বাদশা সেকান্দর হিন্দুস্থানের রাজার সঙ্গে সন্ধি-চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া অন্য পথে রওয়ানা হইয়া সুর্য উদয়ের স্থানে পৌছিল। এসম্পর্কে আলাহ তায়ালা **পবিত্র কোরানে** এরশাদ করেছেন-‘‘বাদশাহ সেকান্দর যখন সুর্যোদয়ের স্থানে যাইয়া পৌছিল, তখন সুর্যকে এমন একটি গোত্রের উপর উদিত হইতে দেখিল, যাহাদের জন্য আমি সুর্য ব্যতীত অন্য কোন পরদা রাখি নাই’’ **(কোরানের সুরা-১৮ (কাহ্‌ফ) এর আয়াত-৮৩ থেকে ৯৮)**। তারপর বাদশা সেই দেশ জয় করিয়া অন্যদিকে যাত্রা করিল। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা কোরান মজীদে এইরূপ এরশাদ করিয়াছেনঃ ‘‘সে আবার অন্যপথ অবলম্বন করিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত যখন দুইটি পর্বতের মধ্যস্থলে গিয়া উপনীত হইল তখন উহার অপর প্রান্তে একটি গোত্রের সাথে তাহার সাক্ষাৎ হইল যাহাদের সাথে তাহার কথা বলার কোন উপায় ছিল না উক্ত দু’টি পর্বত **ইয়াজুজ-মাজুজের** রাজ্যকে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তূ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে ইয়াজুজ-মাজুজের দল আসিয়া পর্বতে অপর প্রান্তের অধিবাসীদের উপর ভীষন অত্যাচার করিত, খুন-জখম করিত এবং গৃহপালিত পশুসহ সব কিছু লুন্ঠন করিয়া নিয়া যাইত। শাহ সেকান্দর তথায় গমন করিলে সেখানকার নিপীড়িত বাসিন্দারা তাহার নিকট আরজ করিল ঔ গিরিপথটিকে বন্দ্ধ করিয়া দিতে যাহাতে ইয়াজুজ-মাজুজরা আর এই দেশে আসিতে না পারে। তাহাদের এই অনুরোধে সেকান্দর বাদশা বলিল আমি ঔপথ বন্দ্ধ করিয়া দিব। তবে তোমরা আমাকে সামান জোগাড় করিয়া দাও। তখন তথাকার অধিবাসীরা প্রাচীর নির্মানের জন্য লৌহ, তামা, পিতল আনিয়া দিল। মহাজ্ঞানী লোকমান হাকীম তখন শাহ সেকান্দরের সঙ্গেই ছিল। তাহার পরামর্শে এবং তত্বাবধানে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মান করা হইল। অতপর আগুন জালাইয়া তামা গলাইয়া ঔ পবিত্র তামা দিয়ে প্রাচীরটিকে এমন ভাবে লেপিয়া দেওয়া হইল যে, তাহাতে পিচ্ছিল হইয়া এইরূপ ধারন করিল যে, উহা বাহিয়া কাহারও উপরে উঠার শক্তি রহিল না। এই প্রাচীরটি দৈর্ঘ্যে তিন ক্রোশ এবং তাহার ঘনত্ব হইল প্রায় দেড়শত গজ। আর উহার উচ্চতা হইল সত্তুর গজ।

এইভাবে প্রাচীর তৈরী করার ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের দল চিরদিনের জন্য প্রাচীরের আড়ালে আবদ্ধ হইয়া রহিল। ফলে প্রাচীরের অপর প্রান্তের অধিবাসীগন চিরদিনের জন্য ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার-জুলুম থেকে নিরাপদ রহিল। মহানবী হযরত রসুলে করীম (দঃ) বলিলেন যে—‘‘আমার নিকট আল্লাহর তরফ থেকে খবর আসিয়াছে যে রোজ কেয়ামতের আগ পর্যন্ত উক্ত প্রাচীর অক্ষুন্ন থাকিবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজ কখনো এপাড়ে আসিতে পারিবে না।

কিন্তূ, ইয়াজুজ-মাজুজের দল এপাড়ে আসার জন্য কম চেস্টা করিতেছে না। তাহারা প্রতিদিন সকালে একযোগে ভোর হইতে সন্দ্ধা পর্যন্ত প্রাচীরের দেওয়াল জ্বিব্বা দ্বারা চাটিতে চাটিতে যখন সন্দ্ধাবেলা উহা পাতলা কাগজের ন্যায় হইয়া যায়, তখন তাহারা বলে এখনত সন্দ্ধা হয়ে গেছে, কাল সকালে এসে আবার

আল্লাহর কি কুদ্‌রত, ভোরবেলা তাহারা সেই প্রাচীরের কাছে এসেই দেখে দেওয়ালটি আবার পুর্বের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। তখন বার বার তাহারা সেই প্রাচীর জ্বিব্বা দিয়ে চাটিতে শুরু করে। এইভাবে রোজ কেয়ামতের অল্প কিছুদিন পুর্ব পর্যন্ত একই অবস্থা চলিতে থাকিবে। অবশেষে কিয়ামত যখন একেবারে আসন্ন তখন সহসা একদিন ইয়াজুজ-মাজুজ আল্লাহ পাকের নামে উক্ত প্রাচীর জ্বিব্বা দ্বারা চাটিতে আরম্ভ করিবে। আর তাহাতেই সেই প্রাচীর বিনাশ হইয়া যাইবে। অমনি ইয়াজুজ-মাজুজের দল পঙ্গপালের মত বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দুনিয়ার সমস্ত পানি, গাছপালা এবং অন্যান্য যাহা কিছু থাকিবে সমস্তই খাইয়া ফেলিবে।''

(পাঠকগনের অবগতির জন্য লিখছি যে উপরোল্লেখিত আজগুবি ঘটনার আসল নায়ক হযরত যুল-কারণাইন আর কেহ নন, তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী ***'আলেক জান্ডার দা গ্রেট'****যার জন্ম হয়ে ছিল গ্রীসে (মেসেডনিয়া) এবং সে ছিল একজন প্যাগান* ***(Pagan)*** *এবং কোণ রূপেই তাকে মুসলমান বা বিশ্বাসী বলা যায় না। মাওলানা ইউসুফ আলীর ইংরেজী কোরান অনুবাদে তার 'সানে-ন'জুলে' পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করা আছে যে এই যুল-কারণাইন ছিলেন* ***'আলেক জান্ডার দা গ্রেট'****। এবার ঠেলা বুঝুন ইসলামী প্রফেট , আল্লাহ ,এবং মোল্লাদের হাতে পড়ে এই ইতিহাসের কি দুরাবস্থা! পাঠকদেরকে আরও অনুরোধ করছি মাওলানা ইউসুফ আলীর কোরানের অনুবাদের সুরা-কাহ্‌ফ এর সানে-ন'জুলটি পড়ে দেখতে।* ***কোরানের সুরা-১৮ (কাহ্‌ফ) এর আয়াত-৮৩ থেকে ৯৮*** *পর্যন্ত আল্লাহ এই তথাকতিত যুল-কারণাইনের আজগুবি গল্পের বিবরন দেন যাহা একেবারে বিকৃত ইতিহাস ছারা আর কিছুই না। মাওলানা ইউসুফ আলীর সানে-নজুল-(পৃষ্ঠাঃ ৭৬০-৭৬৫) পড়ে দেখুন। তা'হলেই কোরানে আল্লাহ যে কত ভুল গল্প ফেদেছেন তাহা জানতে পারবেন।)*

সুত্রঃ কাছাছুল আম্বিয়া; সৌদী কর্তৃক পবিত্র কোরানের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা মহীউদ্দিন খান); পবিত্র কোরানের ইংরেজী অনুবাদ (মাওলানা ঈউসুফ আলী); মু'কসেদুল মুমিনিন ; বেহেস্তের জেওর।

(চলবে)